বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

স্বর্ণময়ী যোগেন্দ্রনাথ মহাবিদ্যালয়

চতুর্থ সেমিস্টারের অন্তর্গত এস. ই. সি. টু . কোর্সের
জন্য উপস্থাপিত

[illegible] পত্রের শিরোনাম

আধুনিক যুগে ‘বীরাঙ্গনা’ কাব্যের নারী চরিত্র

শিক্ষার্থীর নাম :- নীলিমা খাটুয়া
সেমিস্টার - চতুর্থ
পত্র - এস. ই. সি. টু .
রেজিস্ট্রেশন :- VU২১১০৪০২২২,২০২১-২০২২
রোল নং :- ১১১৪১৫২- ২১০০১২

শিক্ষাবর্ষ :- ২০২২ - ২০২৩

Phone: 9932873484/7501133806

SWARNAMOYEE JOGENDRANATH MAHAVIDYALAYA

Govt. Aided General Degree College | Estd.: 2014

At+P.O.: Amdabad, P.S.: Nandigram, Dist.: PurbaMedinipur, PIN 721650

www.sjmahavidyalaya.in| Email: sjmahavidyalaya@gmail.com

CERTIFICATE

This is to certify that Nilima Khatua Roll: 111415 2 No: 210012, Reg.No:- VU211040222 of 2021 - 2022, a student of B.A. 4th Semester (Honours), Bengali Department, Swarnamoyee Jogendranath Mahavidyalaya for the session 2022-2023; submitted his/her project report for partial fulfillment of the syllabus of SEC-2,(CBCS) prescribed by Vidyasagar University. The project has been prepared under the supervision of Dr. Madhumita Basu and Surajit Mandal and ready to place before examiner for evaluation.

Supervisors

....

Dr. Ratan Kumar Samanta
Principal
S.J Mahavidyalaya

Principal
Swarnamoyee Jogendranath Mahavidyalaya
Amdabad :: Purba Medinipur :: Pin-721650

....

Dr. Madhumita Basu
Assistant Professor & HOD
Department of Begali.
S.J Mahavidyalaya

Head of the Department,
Department of Bengali
Swarnamoyee Jogendranath Mahavidyalaya
Amdabad, P.S.- Nandigram, Purba Medinipur, Pin- 721650

Surajit Mandal
SACT-I, Department of Bengali
S.J Mahavidyalaya
Mahavidyalaya

Department of Bengali
S.J. Mahavidyalaya

:: প্রথম অধ্যায় ::

প্রকল্প বিষয়ক সাধারণ আলোচনা

(ক) প্রকল্প কাকে বলে?

⇒ কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সুপরিকল্পিত মূল্যায়নের মাধ্যমে যে কা[জ] সম্পাদনা করা হয় তাকে প্রকল্প বলে,

(খ) প্রকল্পের বৈশিষ্ট্য গুলি কী কী?

⇒ প্রকল্পের বৈশিষ্ট্য গুলি হল—

(i) সমস্যা কেন্দ্রিক:— প্রকল্প হল সমস্যা কেন্দ্রিক অর্থাৎ কোনো না কোনো সমস্যাকে কেন্দ্র করে প্রকল্পের কাজ সম্পাদিত হয়ে থাকে,

(ii) উদ্দেশ্য ভিত্তিক:— কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য করে বা কেন্দ্র করে প্রকল্পের কাজ সম্পাদিত হয়ে থাকে,

(iii) সৃজনশীলতা:— প্রকল্পের কাজের মধ্যদিয়ে শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতা প্রকাশ ঘটে।

(iv) অভিনবত্ব:— প্রকল্প মূলক কাজ সম্পাদনা করতে গিয়ে শিক্ষার্থীর কাজের মধ্যে অভিনবত্ব দেখা যায়,

(v) অনুসন্ধান মূলক কাজ:— প্রকল্প করতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা নানা রকমের অনুসন্ধান মূলক কাজের মধ্যে দিয়ে শেখে,

(vi) বাস্তব কেন্দ্রিকতা:— প্রকল্প ভিত্তিক কাজ সর্বদা কোনো না কোনো বাস্তব সমস্যাকে কেন্দ্র করে হয়ে থাকে,

(vii) প্রকল্প মূলক কাজের মধ্যদিয়ে শিক্ষার্থীরা নিজেদের মধ্যে সহযোগীতা, সহমর্মিতা, সমবেদনা, একে অপরের প্রতি নির্ভরশীলতা ইত্যাদি,

Department of Bengali
S.J. Mahavidyalaya

(গ) প্রকল্প কত প্রকার হয় এবং কী কী ?

⇒ সাধারনত ২ প্রকার হয় যথা — (i) একক প্রকল্প,
(ii) দলগত প্রকল্প,

(ঘ) প্রকল্প কাজের উদ্দেশ্য গুলি কী কী?

⇒ প্রকল্প কাজের উদ্দেশ্য গুলি হল—

(i) প্রতিটি শিক্ষার্থীকে উৎপাদনমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত করা, শিক্ষার্থীকে শৃঙ্খলাবোধ করা এবং তাদের দলবদ্ধ করা, সামাজিক বিকাশ সাধন করা,

(ii) ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে সহযোগিতা বোধ জাগিয়ে তোলা,

(iii) ছাত্র ছাত্রীদের হাতে কলমে কাজ করতে শেখানো,

(iv) ছাত্র ছাত্রীদের সৃজনশীলতা কাজের প্রতিযোগে সহায়তা করা,

(ঙ) প্রকল্প মূলক কাজের উপকারিতা কী?

(i) প্রকল্প রূপায়নে সর্বাধিক শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

(ii) শিক্ষার্থীদের মধ্যে দলগত ভাবে কাজ করার মানসিকতা বৃদ্ধি পায়,

(iii) প্রকল্প রূপায়ন করতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা পড়ার বই বাইরে গিয়ে নিজস্ব জ্ঞান অর্জনে সুযোগ পাওয়া যায়,

(চ) প্রকল্পের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা কী?

⇒ বর্তমানে প্রতিযোগিতামূলক আধুনিক বিশ্বের প্রতিটি দেশের আর্থনৈতিক উন্নয়নের অগ্রগতির জন্য প্রকল্পের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। প্রতিটি দেশে এখন আর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সামাজিক অর্থনৈতিক দিকে বিশেষ নজর দিচ্ছে, তারই অংশ হিসেবে উন্নয়ন পরিকল্পনার সামাজিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প গ্রহন করা হয়ে থা[কে] এবং সেই প্রকল্প সমূহে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সমূহ বিনিয়োগ করা হয় যাতে জাতীয় উন্নয়ন অব্যাহত থাকে,

আধুনিক যুগের বীরাঙ্গনা কাব্যের নারী চরিত্র

▣ মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত্র :- ১৮২৪ সালের ২৫ জানুয়ারি বাংলা প্রেসিডেন্সির যশোর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত হিন্দু কায়স্থ পরিবারে মধুসূদন দত্তের জন্ম হয়। তিনি ছিলেন রাজনারায়ন দত্ত ও তার প্রথমা পত্নী জাহ্নবী দেবীর একমাত্র সন্তান, রাজনারায়ন দত্ত ছিলেন কলকাতার সদর দেওয়ানি আদালতের এক খ্যাতনামা উকিল, মধুসূদনের যখন ৭ বছর বয়স সেই সময় থেকেই তাকে কলকাতায় বসবাস করতে হত। খিদির পুর সার্কুলার গার্ডেন রিচ রোডে অঞ্চলে তিনি এক বিরাট অট্টালিকা নির্মাণ করেছিলেন,

▣ মধুসূদন এর কাব্য:- বাংলা সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন দত্তের মহাকাব্য হল মেঘনাদ বধ (১৮৬১), মেঘনাদ বধ কাব্য ছাড়াও মাইকেল মধুসূদন দত্ত আরও অনেক কাব্য লিখেছেন যেমন — তিলোত্তমা কাব্য (১৮৬০), ব্রজাঙ্গনা কাব্য (১৮৬১), বীরাঙ্গনা কাব্য (১৮৬২) প্রভৃতি, বীরাঙ্গনা কাব্যটি বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম পত্র কাব্য, মাইকেল মধুসূদন দত্তের বীরাঙ্গনা কাব্যের মোট ১১টি সর্গ রয়েছে, এই ১১টি সর্গে মোট ১১ জন পৌরাণিক নারীর কথা আছে, এই ১১জন নারী কেউ তার স্বামীর কাছে কেউ বা প্রনয়ীর কাছে পত্র লিখছে, বাংলা সাহিত্যে অনেক গল্প ও উপন্যাস রচনা করেছেন কিন্তু পত্রকাব্য সম্ভবত এই একটি রচিত হয়েছে,

▣ বীরাঙ্গনা কাব্য:- মধুসূদন এর বীরাঙ্গনা কাব্য প্রকাশিত হয় ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে। এটি 'বাংলা সাহিত্যের প্রথম পত্র কাব্য', ওভিদের 'হিরোইডস' অবলম্বনে এই কাব্য রচিত, কাব্যটিতে ১১টি পত্র রয়েছে, নবযুগ স্রষ্টা মাইকেল মধুসূদন দত্তের বীরাঙ্গনা কাব্য ১১জন পৌরাণিক নারীর, তাঁদের প্রিয় অথবা পতির উদ্দেশ্যে লিখিত পত্রিকা সংকলন,

১) দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা,
২) সোমের প্রতি তারা,
৩) দ্বারকনাথের প্রতি রুক্মিণী,
৪) দশরথের প্রতি কৈকেয়ী,
৫) লক্ষ্মণের প্রতি সূর্পণখা,
৬) অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদী,
৭) দুর্যোধনের প্রতি ভানুমতী,
৮) জয়দ্রথের প্রতি দুঃশলা,
৯) শান্তনুর প্রতি জাহ্নবী,
১০) পুরূরবার প্রতি উর্বশী,
১১) নীলধ্বজের প্রতি জনা,

বীরাঙ্গনা কাব্যের নারী চরিত্র :-

প্রথম সর্গ :- দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা :- নবযুগ স্রষ্টা মাইকেল মধুসূদন দত্তের বীরাঙ্গনা কাব্য ১১জন পৌরাণিক নারী তাঁদের প্রিয় অথবা পতির উদ্দেশ্যে লিখিত পত্রিকা সংকলন, বাংলা সাহিত্যে এই পত্র কাব্য একটি মাত্র রচিত হয়েছে, আমরা জানতে পারি যে এই কাব্যের প্রেরণা ও আদর্শ কবি লাভ করেছেন রোমক কবি ওভিদের রচিত দি হীরোইদেস থেকে এবং উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন বিভিন্ন পুরান মহাকাব্য এবং প্রাচীন সংস্কৃত কবিদের কাছ থেকে, বীরাঙ্গনা কাব্যের প্রথম সর্গ শকুন্তলা পত্রিকার উপাদান কবি সংগ্রহ করেছিলেন মহাকবি কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলম থেকে, এই পত্রটি বীরাঙ্গনা কাব্যের প্রথম সর্গ, দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে গান্ধর্ব মতে বিবাহ করে নিজ রাজ্যে ফিরে গেছে, দীর্ঘ দিন পেরিয়ে গেলেও দুষ্মন্ত শকুন্তলার কাছে ফিরে আসেনি, তাই শকুন্তলা দুষ্মন্তের ফিরে না আসায় শকুন্তলা আক্ষেপ এবং বিরহে এই পত্র রচনা করেন, শকুন্তলা বিরহে সব শূন্য সব অন্ধকার ময় দেখছেন, শকুন্তলার মধ্যে সাধ্বী রমনী সত্তা বিদ্যমান ছিল, যদলে পতির কল্যাণ কামনায় তাঁর জীবনের এক ব্রত স্বরূপ,

সেই জন্য তিনি তাঁর দুঃখের করুণ কথা কারোর কাছে প্রকাশ করতে পারছেন না, তাঁর ভয়, পাছে তাঁর দুঃখের কথা শুনে বনদেব-দেবী দুষ্মন্তকে অভিশাপ দেন কিম্বা তাঁকে বিমনা দেখলে তাঁর প্রিয় সখীদ্বয় ক্ষুব্ধ হয়ে দুষ্মন্তের নিন্দা করে। পুরাণ উপাখ্যান থেকে দৃষ্টান্ত টেনে দেখানো যায়, এই সংস্কার এতই বদ্ধমূল ছিল সতীর মনে যার ফলে পতি নিন্দা সে আর শুনবে না বলেই দেহত্যাগ করেছিল সেই সংস্কার এখানে শকুন্তলার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। "পতি নিন্দা শোনা পাপ" এই ধারণা থাকার জন্যেই শকুন্তলা বিরহ বেদনা ব্যক্ত করতে পারছেন না, তাঁর বিরহ ব্যথা এতই যে ~~তিনি~~ তাঁকে আচ্ছন্ন করছে ততই তিনি দেখতে পাচ্ছেন আশ্রম জুড়ে জড়িয়ে থাকা তাঁর স্বামীর প্রেমের নানা নিদর্শন একদিকে বিরহ ব্যথা, অন্যদিকে স্বামীর কল্যাণ কামনা এই দোটানায় পড়ে শকুন্তলার আহারে রুচি নেই, চোখে নিদ্রা নেই এবং মাঝে মাঝে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। চেতনা ফিরে পেলেই দেখেন সামনে দুষ্মন্তের মূর্তি, দুহাত বাড়িয়ে স্বামীর চরণযুগল বেষ্টন করার জন্যে ছুটে যায়, তখনই ভুল ভেঙে কান্নায় ভেঙে পড়ে। মাঝে মাঝে শকুন্তলা স্বপ্নে দেখেন দুষ্মন্তের রাজপ্রাসাদ রাজৈশ্বর্যের

"স্বর্ণ-রত্ন সংঘটিত দেখি অট্টালিকা.
দ্বিরদ-রদ নির্মিত দুয়ারে দুয়ারী
দ্বিরদ; সুবর্ণাসন দেখি স্থানে স্থানে
মৃণালশয্যা; বিদ্যাধরী-গন্ধর্বী কিঙ্করী
কেহ গায়, কেহ নাচে; যোগায় আনিয়া
বিবিধ ভূষণ কেহ, কেহ উপাদেয়
~~[illegible]~~
রাজভোগ! দেখি মুক্তা মণি রাশি রাশি,
অলকা-সদনে যেন",

স্পষ্টই বুঝতে পারা যায় শকুন্তলার অবস্থা দুষ্মন্তময়।
মুদ্রিত নয়নে সংজ্ঞা প্রাপ্তির পর যেমন তিনি দুষ্মন্তকে দেখছেন
যদি ঘুম আসে তাহলে স্বপ্নেও তিনি দুষ্মন্তের ঐশ্বর্য দেখছেন,
দুষ্মন্তকে দেখছেন —

“তোমায়, স্বামি, দেখি স্বর্ণ সিংহাসনে!
শিরোপরি রাজছত্র; রাজদণ্ড হাতে,
মন্ডিত অমূল্য - রত্নে সসাগরা ধরা,
রাজকর করে, নত রাজীব-চরণে।”

শয়নে স্বপনে জাগরণে শকুন্তলার দুষ্মন্ত চিন্তাই তার একমাত্র ধ্যান, স্বামীর দেবেন্দ্র সদৃশ ঐশ্বর্য থাকলেও শকুন্তলার মনে সে বিষয়ে কোন লোভ নেই — 'নাহি লোভে দাসী বিভব', তিনি কেবলমাত্র দাসী রূপে স্বামীর চরণ সেবা করে ধন্য হতে চান, তাই তাঁর প্রার্থনা 'কিঙ্করী করিয়া মোরে রাখ রাজপদে',

শকুন্তলার ঐশ্বর্য লোভ বা বাসনা যেমন নেই, তেমনি প্রোষিতভর্তৃকা ও বিরহ দশার জন্যেও অপর কোন ব্যক্তির ওপর তাঁর ক্রোধ বা ক্ষোভ নেই, তিনি অদৃষ্টবাদী তার বিরহ এ সবই তাঁর ললাট লিখন, তার বক্তব্য —

“চির অভাগিনী আমি! এমন ভাবনা
ত্যজিলা বিস্মরে মোরে, না জানি কি পাপে?
এ সব ভাবনা এবে ভাবিলা কি তুমি,
প্রাণপতি?

মহাকবি কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলম অবলম্বনে মধুসূদন নাট্য - লক্ষণাক্রান্ত এই পত্রিকাটি রচনা করেছেন, কিন্তু মহাকবিকে তিনি হুবহু অনুকরণ করেন নি, ফলে তাঁর শকুন্তলা চরিত্রে ও কাহিনীতে কিছু পার্থক্য ও মৌলিকতা লক্ষ্য করা যায়।

বীরাঙ্গনা কাব্যের প্রথম সর্গে শকুন্তলার যে চরিত্র চিত্রিত হয়েছে তা সংক্ষেপে এই রূপ — তিনি নম্র, বালিকা স্বভাবযুক্তা, আশ্রমকন্যা, তিনি আত্মবাদী, ভালো মন্দ লাভ প্রাপ্তি সম্বন্ধে তিনি বেখবর, স্বামীর কল্যাণ কামনাই তার জীবনের মূল ব্রত, তিনি প্রেমকাতর নন, তিনি হিংসাদ্বেষ অনুরাগের ঊর্ধ্বে। তিনি ক্ষমাশীলা নারী, তিনি আশাবাদী, তাঁর একমাত্র আশা দুঃখ দুর্ভাগ্য অপগত হয়ে অবশেষে তিনি তাঁর পতির চরণে আশ্রয় লাভ করবেন,

❋ দ্বিতীয় সর্গ :- সোমের প্রতি তারা :- নবজাগরণের কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত পৌরাণিক নারী চরিত্র নিয়ে নবযুগোপযোগী যে বক্তব্য সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন তা রোমক কবি পাবলিয়াস ওভিডিয়াস নাসো বা ওভিদের আদর্শে প্রণীত, ওভিদের হিরোইদস এর মতোই এখানে পৌরাণিক নারী চরিত্রগুলির নবায়ন ঘটানো হয়েছে আবার চরিত্র চয়নের ক্ষেত্রেও সতী সাধ্বী রমণী থেকে শুরু করে অবলা- বিবিধ ও অন্যান্য নারী চরিত্রগুলি চিত্রিত হয়েছে, সুরতি ও প্রোষিত স্নেহ সমস্ত নারীদের মনোভাব বিশেষ করে প্রণয়মূলক মানসিকতার প্রকাশ ঘটেছে বীরাঙ্গনা কাব্যে, এই কাব্যের নায়িকারা প্রত্যেকেই নিজে পেশ করার ক্ষমতাধারিনী, স্বতন্ত্র সবলা অর্থাৎ নিজের বক্তব্য ... বীর্যে তাঁরা অসামান্যা ব্যক্তিত্বে, তাঁরা প্রত্যেকেই মহীয়সী, প্রেমের বীর্যে তাঁরা অসামান্যা, মধুসূদন তাঁদের প্রত্যেককে স্বতন্ত্র মানুষ রূপে স্বীকৃতি দিয়েছেন,

এটি বীরাঙ্গনা কাব্যের দ্বিতীয় সর্গ, এই পত্রে দেবগুরু বৃহস্পতির স্ত্রী হয়েও তারা প্রণয় ভিক্ষা করেছেন বৃহস্পতির শিষ্য সোমের কাছে, গুরু পত্নী ও শিষ্যের অবৈধ প্রেম কাহিনী এই পত্রের মূল বিষয়, এ পত্রিকা থেকে তারার যে চরিত্রটি ফুটে ওঠে তাতে মধুসূদন তাঁকে যে একটি বিদ্রোহিনী নায়িকা রূপে উপস্থাপন করতে চেয়েছেন,

দেবগুরু বৃহস্পতির পত্নী তারা, স্বামীর শিষ্য সোমকে যে পত্র লিখেছিলো তাতে তাঁর প্রেম পিপাসার কথা ধ্বনিত হয়েছে, বয়ঃবৃদ্ধ দেবগুরু বৃহস্পতি জ্ঞানী, তপস্বী, সবদের শ্রদ্ধেয় আর্য। যুবতী তারার যৌবন ও মনের প্রতি তাঁর হয়তো ততটা আকর্ষণ ছিলনা, তারার পত্রিকা থেকে স্পষ্টই বুঝতে পারা যায় তিনি স্বামীর প্রেম বঞ্চিতা এবং প্রেম বুভুক্ষু। সেই প্রেম বুভুক্ষু মন নিয়েই তারা সংসারের কাজ করেন, শিষ্যদের প্রতি মাতৃতুল্য যত্নাদর করে থাকেন। সেই অবস্থায় যেদিন সোম বা চন্দ্র তাঁর স্বামী বৃহস্পতির কাছে বিদ্যার্জন যত্নাদর করে থাকেন, সেই অবস্থায় এলো সেদিন সেই প্রথম দর্শনেই সোমের প্রতি তারা প্রেমাসক্ত হয়ে গেলেন এবং সোমকে মনের সে ভাব জানতে না দিয়েই নিঃশব্দে তাঁর সেবা করতে লাগলেন, সেই দিনই তারা তাঁর মনের ভাব, অবশেষে, যেদিন সোম বিদ্যার্জন শেষে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের আয়োজন করতে লাগলেন, সেই দিনই তারা তাঁর মনের ভাব ব্যক্ত করে সোমকে পত্র লিখে পাঠালেন। লিখলেন প্রথম দিন থেকে তিনি অলক্ষ্যে থেকে চন্দ্রের সেবা করে এসেছেন তাঁর আচরণের কথা, কত ভাবে তিনি তাঁকে পতি জ্ঞান করে — তার বর্ণনা,

পৌরাণিক যুগে যে প্রেমের আবেগ ব্যক্ত হতে পারেনি মধুকবি সেই আবেগকে আধুনিক যুগোপযোগী করে ব্যক্ত করলেন। ফলে বিবাহিত স্ত্রীর পক্ষে অপর কোন পুরুষের প্রতি প্রণয়াকাঙ্খা সমাজে নিন্দিত হলেও চন্দ্রের প্রতি তারার এই প্রেম পত্রিকা নন্দিত হল সাহিত্য সমাজে, ফলে বীরাঙ্গনা কাব্যের সূত্র ধরেই সাহিত্যে রচিত হতে থাকল অবৈধ প্রণয়মূলক গল্প।

কাহিনী বিশেষ করে নারী মনের অস্তিত্ব সচেতন সাহিত্য, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ সকলেই এই ধারাকে অঙ্গীকার করেছেন তাঁদের রচনায়, যার ফলে তাঁদের কাব্যে সাহিত্যে সৃষ্টি হয়েছে বলিষ্ঠ নারী চরিত্র, তাদের মধ্যে অনেকেই বীরাঙ্গনা তারার মতো বিদ্রোহিনী,

"গুরুর প্রসাদ- অন্নে সদা ছিলা রত
তারাকান্ত; ফেলেনাকে আচমন-হেতু
যোগাইতে জল যবে গুরুর আদেশে
বহির্দ্বারে, কত যে কি রাখিতাম পাতে
চুরি করি আনি আমি,"

কিম্বা— "সত্য কথা এবে কহি, গুণ নিধি;—
নিশীথে ত্যজিয়া শয্যা পশিতে কাননে
এ কিঙ্করী; ফুলরাশি তুলি চারি দিকে
রাখি তোমার জন্যে!"

তারার এই প্রেম চন্দ্রকে প্রথম দর্শনের সময়েই সঞ্চারিত হলেও এ প্রেমের কথা তিনি কাউকে জানতে দেন নি, কিন্তু বিদ্যা অর্জন শেষে চন্দ্র স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের আয়োজন করলে তারা তাঁকে পত্রে তাঁর প্রণয়াকাঙ্ক্ষার কথা জানালেন, কিন্তু তারা প্রেমের আবেগে অচেতন ছিলেন না, সমাজের রীতিনীতি, চন্দ্রের সঙ্গে তার পরস্পর সম্পর্ক সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন তারা, তাই চন্দ্রকে পত্র লেখা শুরু করেই নিজেকে, নিজের লেখনীকে ধিক্কার দিয়েছেন তিনি, "কি লজ্জা! কেমনে তুই, রে পোড়া লেখনি লিখিলি ও পাপ কথা"? গুরু পত্নী রূপে চন্দ্র যখন তাঁকে প্রণাম করতেন তারা তখন মনে ভাবতেন,

'মানিনী যুবতী আমি, তুমি প্রানপতি
মান-ভঙ্গ- আসে নত দাসীর চরণে,'

তারার এই প্রেম ভাবনা ক্রমশ: তাকে চন্দ্রের পত্নীরূপে প্রতি করেছে, যার ফলে তারা চন্দ্রের স্ত্রী রোহিণীকে স্বপত্নী স্থানে ঈর্ষা করেছেন, তাকে রাগ করে নিশাযোগে পদ্ম প্রস্ফুটিত হলে চন্দ্রের প্রেমিকা স্থানে তার প্রেমেরই প্রকাশ, ঘটিয়েছেন, বস্তুত: তারার এই স্বপ্ন মনোভাব তার প্রেম সম্পর্কে আত্মা জন্মানোর নতুন প্রেম সৃষ্টি করে তোলে, ক্রমশ: প্রেমের চরমতম প্রকাশ ঘটে তখন, সাথে সাথে তা অন্তর্হিত হয়, প্রেমের চরমতম প্রকাশ ঘটে তখন, যখন তারা সমস্ত কথা, ভাবনা, সিদ্ধান্ত জানানোর পরেও চন্দ্রকে লেখেন-

জীবন মরন মম আজি তব হাতে", নিজের কার্য সম্পর্কে সচেতন হয়েও যখন তার নিজেকে সংযত করার অনিরুদ্ধ আবেগকে দমন করার আর কোন উপায় তিনি পেলেন না, তখনই জীবন মৃত্যুর ভার প্রেমাস্পদের হাতে অর্পণ করে মুক্তির প্রার্থনা করলেন, এখানে তাঁর মানসিক দ্বন্দ্ব ও পরিস্থিতি চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে।

▨ কবি মধুসূদন সামাজিক নীতির দিক থেকে তারাকে বিচার করেননি, মানবতাবাদের দিক থেকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন তারার নারী জীবনের এক অপ্রতিরোধ্য দুর্নিবার প্রেমের আবেগ ও প্রবৃত্তির উন্মাদনা, যার ফলে ঋষি পত্নী এবং ঋষিকুলবধূ হয়েও তারা অনার্য নারীর মতো আচরন করে নিজেকে চণ্ডালিনী বলে ধিক্কৃত করেছেন, সে আবেগকে সংযত করার মতো ক্ষমতা তারার নেই, তবু তারা মাথা উঁচু করে নিজ মনের কথা আত্মবিশ্লেষণসহ তুলে ধরেছেন তাঁর প্রেম পত্রিকায়, এই কারণেই তারা এক বিদ্রোহিনী চরিত্র।

❀ তৃতীয় সর্গ : <u>দ্বারকনাথের প্রতি রুক্মিণী</u> :- মাইকেল মধুসূদন দত্তের অনবদ্য অবদান 'বীরাঙ্গনা কাব্যের নায়িকারা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী, কেউ বীর্যবতী, কেউ লজ্জাশীলা, কেউ প্রেমমুখরা, কেউ আবার নব প্রেমারুনচ্ছটায় বিনম্রা, প্রত্যেক নায়িকাই তাঁর প্রেমাস্পদ বা দয়িতের কাছে পত্র প্রেরণ করেছেন নিজের মানসিক পরিস্থিতি জ্ঞাপন করে, বিদর্ভাধিপতি ভীষ্মক রাজের কন্যা রুক্মিণী দেবীও এই রকমই এক পত্র প্রেরণ করেছিলেন দ্বারকাপতি শ্রীকৃষ্ণকে, সংকট কালে থেকে উদ্ধার প্রার্থনা করে।

পৌরাণিক ইতিবৃত্ত অনুযায়ী রুক্মিণী দেবী স্বয়ং লক্ষ্মীর অবতার, সেই সূত্রে তিনি আজন্ম বিষ্ণুপরায়ণা, শৈশব থেকেই তাই তিনি মনে মনে পতিত্বে বরণ করেছেন দ্বারকাপতি শ্রীকৃষ্ণকে, কোনো এক নিশীথ স্বপ্নে নবীন-নীরদ-বর্ণ শ্যাম কিশোরকে দেখে তিনি তাঁতে মন অর্পণ করেছেন, এক্ষণে তাঁর যৌবনকাল উপস্থিত হওয়ার তাঁর ভ্রাতা রুক্ম, চেদীশ্বর শিশুপালের সঙ্গে তাঁর বিবাহ দিতে উদ্যোগী হলে অনন্যগতি হয়ে নব যুবতী রুক্মিণী দ্বারকাপতিকে তার একান্তিক প্রেম বিজ্ঞাপন পত্র প্রদান করে, শিশুপাল বিবাহ করতে আসবার আগে যাতে দ্বারকাপতি বিদর্ভনগরীতে এসে তাঁকে হরন করে নিয়ে যান সেই অভিলাষ ব্যক্ত করেছেন, সমগ্র পত্রের মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে রুক্মিণীর একনিষ্ঠ প্রেম ও নবযুবতীর সলজ্জ ভীরুভাব, তিনি লোকমুখে দ্বারকাপতি শ্রীকৃষ্ণকে স্বামীরূপে বরন করার ফলে অন্য আর কারোর কাছেই তিনি হৃদয়কুসুমকে উন্মুক্ত করতে পারেন না, কেননা, তাতে বিচারিণী হতে হবে, প্রেমে একনিষ্ঠা রুক্মিণী দেবী তা করতে পারেন না, তাই বিবাহের উদ্যোগ আয়োজন দেখে তিনি দ্বারকাপতিকে পত্র লিখতে বসেছেন, কিন্তু দ্বিধা কম্পিত হৃদয়ে লেখনী ধারণ করতে সলজ্জ সঙ্কোচে অভিভূত হচ্ছেন। তবু তিনি মনের কথা ব্যক্ত করতে সচেষ্ট হয়েছেন,

রুক্মিনীর মন যে সরলতায় পূর্ণ তার প্রমাণ পাওয়া যায় পত্রটির মধ্যে নিজের কথার চেয়ে দ্বারকাপতির স্তুতি মুখরতায়, শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, আবির্ভাবের উদ্দেশ্য এবং নানা কীর্তির প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করে অবশেষে তিনি নিজেকে তাঁর চরণে সমর্পণ করতে চেয়ে তাঁকে হরণ করে নিয়ে যাবার জন্যে প্রার্থনা জানিয়েছেন সেই প্রার্থনা পত্র থেকে বোঝা গেছে, রুক্মিনী আত্মঅভিমানশীল, তিনি প্রাণে তাঁর রূপ গুণ এমন কিছু নেই যাতে নিজেকে উত্তম প্রমাণ করতে পারেন, অথচ অতি সঙ্কোচে দ্বারকাপতির কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন।

রুক্মিনীর প্রেমভাব এতই প্রবল যে তিনি কান্তের বিরহ সহ্য করতে না পেরে আত্মরতিরসে মগ্ন হয়েছেন। বিদর্ভ রাজ্যে যে স্রোতস্বিনী বহমান তাকে সম্বোধন করেন 'যমুনা' নামে। কৃত্রিম বৃন্দাবন রচনা করতে নদীর তীরে তমাল, তাল প্রভৃতি বৃক্ষরোপণ করে 'যমুনা-পুলিনে' সৃষ্টি করেছেন, সেখানে ময়ূর-ময়ূরী শুক-সারী পাখি পুষেছেন, এভাবে কৃত্রিম বৃন্দাবন রচনা করে তিনি প্রিয়র সান্নিধ্য সাধনা করেছেন। তাঁর এই আচরণ থেকে একদিকে যেমন তাঁর সরলা হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি বিম্বিত হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি প্রিয়র সঙ্গ ও বিরহের ক্ষেত্রে নিজেকে নিয়োজিত করার সাধনা প্রকট হয়েছে। বস্তুত রুক্মিনীর এই আত্মরতি ভাব শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্য তাঁর গভীর প্রেমের কথাই ব্যক্ত করে।

সব মিলিয়ে আলোচ্য পত্রের মধ্যে রুক্মিনীর যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতে তিনি আত্মময়ী, আত্মপ্রেমময়ী, সরলা, জীবন সম্বন্ধে অনভিজ্ঞা বালিকা, শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে মন প্রাণ অর্পণ করে পিতা ও ভ্রাতার অধীনা হয়েও দ্বিচারিনী হওয়া তার পক্ষে অসম্ভব বলেই সাহসে ভর করে দ্বারকানাথকে তিনি পত্র প্রেরণ করেছেন। সরলা বালিকার এই একনিষ্ঠ প্রেম ও সাহসই তাঁকে বীরাঙ্গনা করে তুলেছে।

⊛ চতুর্থ সর্গঃ- **দশরথের প্রতি কৈকেয়ীঃ-** মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রাচীন সাহিত্যের উপাদান সংগ্রহ করে নতুন যুগের উপযোগী কাহিনী নির্মাণ করে বাংলা সাহিত্য জগতে নবত্ব পরবর্তীকালে অপরাপর কবি সাহিত্যিকের হাত ধরে আজও প্রবাহিত হয়ে চলেছে, ছন্দ প্রয়োগে যেমন কবি মধুসূদন নতুনের আহ্বান জানিয়ে ছিলেন, তেমনি রচনা রীতির ক্ষেত্রেও বাংলার নতুন ভাবধারার প্রবর্তন করেন, তাঁর বীরাঙ্গনা কাব্য এমনই এক অদ্ভুত সৃষ্টি যার মধ্যে তাঁর নতুন ভাবনা চিন্তা, নতুন ধারা প্রচলন এবং আত্মসৃষ্টির সংস্কার ও সংস্কারি ও সংশোধনী মানসিকতার প্রতিবিম্বন ঘটেছে, বীরাঙ্গনা কাব্য পত্র-কাব্য এবং সম্ভবত বাংলা সাহিত্যে একমাত্র পত্রকাব্য, বাংলায় পদ্যোপন্যাস হাল আমলের সাহিত্যেও নজরে পড়ে কিন্তু পত্রকাব্য তার দৃষ্টিগোচর হয়না, খুব সম্ভব এই একটিই মাত্র পত্র কাব্যই বাংলা ভাষায় রচিত হয়েছিল,

এই কাব্য বীরাঙ্গনা কাব্যের চতুর্থ সর্গ, এই পত্রে কৈকেয়ী তার স্বামী দশরথকে উদ্দেশ্য করে এই পত্র লেখেন, রাজা দশরথ কৈকেয়ী কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে তার পুত্র ভরত রাজা হবে, সেই সময়ে দশরথ ভুলে গিয়েছিলে রাজধর্মকে, কিন্তু ধর্ম মতে তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজা করেন, এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের জন্য স্বামীর প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে এই পত্র লেখেন,

বিভিন্ন প্রোষিতভর্তৃকা পৌরাণিক নায়িকার তাঁদের প্রেমাস্পদ অথবা স্বামীর উদ্দেশ্যে লিখিত পত্রের সমবায়ে সৃষ্টি বীরাঙ্গনা কাব্য করেন নি, প্রয়োজনে রচনা আদর্শকে গ্রহন, বর্জন এবং সংস্কার সাধন করে নিয়েছেন কবি, ফলে বিদেশী আদর্শ প্রসূত হলেও প্রাচ্য ভাবধারার মুখ্যতা এখানে লক্ষ্য করা যায়, আবার মহাকাব্য থেকে উপাদান সংগৃহীত হলেও তার ঘটনাকে হুবহু অনুসরন না করে প্রয়োজনে কিছু গ্রহন বর্জন এবং সংস্কার সাধন করে নিয়েছেন কবি, ফলে পুরান, মহাকাব্য ও প্রাচীন সাহিত্য থেকে বীরাঙ্গনা কাব্যের চরিত্র ও কাহিনীর উপাদান চয়ন করলেও বীরাঙ্গনা কাব্য হয়ে উঠেছে কবির মৌলিক সৃষ্টি,

কেকয়ীর আচরণে বিশেষভাবে লক্ষ্য করে দেখলে তাঁকে নিতান্ত স্বার্থবাদী বলে মনে হয় না, তিনি পুত্র ভরতের সিংহাসন প্রাপ্তির জন্য লড়াই করেছেন বটে, কিন্তু তাঁর পত্রে তার চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে রাজা দশরথের সত্যরক্ষার দাবী, ধর্মের দাবী, রঘুকুলপতির সত্য রক্ষা ও ধর্মপালনে অবহেলা তিনি প্রিয়তমা মহিষী হয়ে তা সহ্য করবেন, কিরূপ? তাই সত্যরক্ষা ও ধর্মপালনের জন্য রাজাকে তিনি নানাভাবে প্ররোচিত করেছেন এবং প্রয়োজনে কটাক্ষবাণে বিদ্ধ করেছেন,

সপত্নীর প্রতি ঈর্ষোক্তি: কেকয়ী তাঁর পৌঢ়ত্বে দেহের যৌবন ধরে রেখে পড়ার ইঙ্গিত করে দশরথকে কামুক বলে অভিহিত করে, বিদ্রূপের খোঁচায় তাঁকে ধর্মাচরণে ও সত্যপালনে ব্রতী করতে চেয়েছেন, আঘাত করে অচেতনতা বা বিস্মরণকে স্মরণ করাতে চেয়েছেন, কেন না কেকয়ী ন্যায় বিচার চান এবং তিনি বলেছেন, রাজার কাজই ন্যায় বিচারের, সেই রাজাই যদি অন্যায় করতে থাকেন তা হলে তাঁর উপযুক্ত সহধর্মিনী, প্রিয়তমা মহিষীর একমাত্র কর্তব্য হল রাজা বা স্বামীকে ন্যায়ের পথে চালিত করা, সেই কাজ করতেই কেকয়ী কঠিন বিচারকের ভূমিকা নিয়েছেন,

ভরতের পরিবর্তে জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম রাজা হলে কেকয়ী ক্ষুব্ধ, ক্রদ্ধ হয়েছেন ঠিকই কিন্তু বীরাঙ্গনার কেকয়ী তার চেয়ে বেশি ব্যথিত হয়েছে রাজা দশরথের অধর্মাচরণে, তিনি তার স্বামীর কাছে সভাস্থানে সে অপ্রিয় সত্য নিবেদন করতে গিয়ে বলেছেন, স্বামী গুরুজন না হলে তিনি মুক্ত কন্ঠে বলতেন

"অসত্য - বাদী রঘু কুল- পতি!
নির্লজ্জ! প্রতিজ্ঞা তিনি লঙ্ঘেন সহজে!
ধর্ম - শব্দ মুখে, গতি অধর্মের পথে!"

✽ প্রথম সর্গঃ- লক্ষ্মণের প্রতি শূর্পণখাঃ- এই পত্রে এক বাল্য-বিধবার প্রেম-নিবেদন ব্যক্ত হইয়াছে। মেঘনাদবধ কাব্যে কবি যেমন রাক্ষসদিগকে রাক্ষস হিসেবে বর্ণনা করেন নাই, বীরাঙ্গনা কাব্যেও তেমনি তিনি তাঁহার নায়িকা শূর্পণখাকে বীভৎসাকৃতি অনার্য নারীরূপে কল্পনা করেন নাই, কবি তাই পত্রের প্রারম্ভে পাঠকদিগের উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন যে এই পত্রিকাখানি পড়িতে হইলে বাল্মীকি বর্ণিত বিকট-দর্শনা শূর্পণখাকে ভুলিতে হইবে এবং তাহাকে একজন সুন্দরী বিধবা রমণী হিসাবে কল্পনা করিতে হইবে, বলা বাহুল্য কাব্যের অনুরোধেই কবি এই কথা বলিয়াছেন এবং প্রেমার্তা শূর্পণখাকে সুরূপা কল্পনা করিয়া তিনি কাব্যোচিত কার্যই করিয়াছেন, শূর্পণখা তাই মধুসূদনের এক নূতন ও সার্থক সৃষ্টি।

পঞ্চবটী বন, রামচন্দ্র ও সীতার সঙ্গে সেই বনে থাকেন লক্ষ্মণ, লক্ষ্মণের তরুণ যৌবনের অনিন্দ্য সৌন্দর্য বাল্য-বিধবা শূর্পণখার মন হরণ করিয়াছে, শূর্পণখার মনে হইয়াছে লক্ষ্মণ একাকী এবং অবিবাহিত, এ অবস্থায় তাহার পক্ষে বনবাসী লক্ষ্মণের নিকট প্রেম-নিবেদন আদৌ অসঙ্গত নয়। যে, মধুসূদনের হাতে পড়িয়া শূর্পণখার পূর্বরাগ এক অপূর্ব কবিত্বসুষমায় মণ্ডিত হইয়াছে, রাক্ষস-কন্যা হইলেও তাহার হৃদয়ে যে প্রেম থাকিতে পারে এবং সে প্রেমের অনুরাগ-রঞ্জিত অভিব্যক্তি থাকিতে পারে, কবি শূর্পণখা-পত্রিকায় তাহাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন:—

কোন যুবতীর নব যৌবনের মধু
বাঞ্ছা তব? অনিমেষে রূপ তার ধরি,
(কামরূপা আমি নাথ) সেবিব তোমারে।

শূর্পণখা যে মায়ারূপ ধারণপূর্বক রূপসী সাজিতে পারে, কবি এখানে তাহারই ইঙ্গিত দিয়াছেন।

প্রথম দর্শনেই শূর্পণখা লক্ষ্মণকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে, নবযৌবনে লক্ষ্মণ শিরে জটাজুট রাখিয়া, ফলমূল খাইয়া পঞ্চবটী বনে ভ্রমণ করিতেছেন, তাহা দেখিয়া শূর্পণখার শুধু আগ্রহ জাগে নাই, সেই সঙ্গে তাহার বুকও দুঃখে ফাটিয়া যাইতেছে, লক্ষ্মণ রাত্রে ভূতলে শয়ন করিয়া থাকেন, ইহা মনে করিয়া শূর্পণখা তাহার স্বর্ণশয্যা ত্যাগ করিয়া বিনিদ্র রজনী যাপন করে।

যদি তাঁহার অর্থের প্রয়োজন হয়, তিনি অলংকার ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দিবেন, তাহার অনুরোধে স্বয়ং চামুণ্ডাও রণে অবতীর্ণ হইবেন, তাহার প্রেমিক যদি কোন যুবতীর নবযৌবনের মধু পান করিতে চায় তবে সূর্পণখা তাহার রূপ ধারণ করিয়া কামনা তৃপ্ত করিবে, সে সেবা করিয়া, নৃত্য-গীতে মুগ্ধ করিয়া তাঁহাকে সুবর্ণ নির্মিত গৃহে নানা ভাবে আনন্দ-বিধান করিবে,

কায়, মনঃ প্রাণ আমি সঁপিব তোমারে!
ভুঞ্জ আসি রাজ-ভোগ দাসীর আলয়ে,

প্রেমের প্রেরণায় সূর্পণখা রাজবেশ ত্যাগ করিয়া উদাসিনীর বেশ গ্রহণ করিতেও সম্মত, মুক্তামালার পরিবর্তে সে ধারণ করিবে রুদ্রাক্ষের মালা, সে তাহার প্রেম গুরুপদে সানন্দে যৌবন ধন সমর্পণ করিবে,

লক্ষ্মণের প্রতি সূর্পণখার অনুরাগ যে আন্তরিক, তাহার প্রমাণ, লক্ষ্মণের জন্য সে সকল সুখ সমৃদ্ধি ত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিতা নহে, প্রেমের গভীরতার চিত্র-অঙ্কনে সিদ্ধহস্ত কবি তাই সূর্পণখার প্রেমের লালসাই প্রদর্শন করেন নাই, সেই সঙ্গে তাহার অনুরাগের একনিষ্ঠতার কথাও বলিয়াছেন, সূর্পণখার প্রেমের প্রগাঢ়তা বুঝাইবার জন্য কবি তাহার মুখ দিয়া শেষে এমন কথাও বলাইয়াছেন যে, সূর্পণখা যে সত্যই রূপসী, একথা যদি লক্ষ্মণের বিশ্বাস না হয় তবে তিনি যেন আসিয়া স্বচক্ষে তাহাকে একবার দেখিয়া যান, আসিয়া যদি দেখেন সে রূপহীনা, তবে তিনি স্বচ্ছন্দে ফিরিয়া যাইতে পারেন:

কি রূপ বিধাতা
দিয়াছেন, আসুন আমি দেখ, গুণমণি!
আইস মলয় রূপে; গন্ধহীন যদি
এ কুসুম, ফিরে তবে যাইও তখনি!

রাক্ষসকন্যা হইলেও সূর্পণখার হৃদয়ে যে প্রকৃত অনুরাগের সঞ্চার হইয়াছে, তাহার অন্তরবাণী সে সাক্ষ্য বহন করিতেছে, রাক্ষসীকে প্রেমময়ী করিয়া কবি যে রোমান্টিক দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন তাহা আমাদের মুগ্ধ করে,

* একাদশ তম সর্গ :- নীলধ্বজের প্রতি জনা :-

মাইকেল মধুসূদন দত্ত বীরাঙ্গনা কাব্যের মধ্যে তাঁর কাব্য প্রতিভার সামগ্রিক প্রতিফলন নিহিত করেছেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত এই কাব্যের মধ্যে কোমলতা ও কাঠিন্যের সমাবেশে হয়েছে যুগ বিপ্লবী মানবতাবাদের অঙ্কুরোদগম, এখানে নারী নারীর পূর্ণ মর্যাদা পেয়েছে। সমাজরীতির চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে শিল্প সৃষ্টির সৌন্দর্য চাতুর্য, নারী মাত্রই এখানে কল্পিত হয়েছে বীরাঙ্গনা রূপে। বীর অর্থে কেবল তেজস্বিনী যোদ্ধা নয়, বীরাঙ্গনা অর্থে প্রবাসিত বোঝানো হয়েছে ব্যক্তিত্বময়ী নারী, প্রকৃতপক্ষে সে অর্থে বীর বলতে একমাত্র জনাকেই গণ্য করা চলে। একাদশটি নায়িকার মধ্যে যথার্থ ক্ষত্রিয় রমণীর তেজ ও সাহস একমাত্র জনার মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু তা স্বামীর বিরুদ্ধে সত্য নিষ্ঠ স্ত্রীর সতেজ কণ্ঠস্বর, ফলে সাহসী তেজস্বিনীরূপে জনাকেই যথার্থ বীরাঙ্গনা বলা যায়।

বীরাঙ্গনা কাব্যের একাদশজন অঙ্গনার মধ্যে দুজন মাত্র সতেজে অনুযোগ পত্র লিখেছিলেন, একজন হলেন কেকয়ী, অপরজন জনা, উভয়েরই অনুযোগ পত্রিকার রচনার মূল কারণ স্বামীর অন্যায় ব্যবহার, সত্য ভ্রষ্ট হবার আশঙ্কা যা ক্ষত্রিয় রমনীরূপে তাঁদের আত্মগ্লানির কারন হয়ে দাঁড়িয়েছে, উভয়ের ক্ষোভের কারন কেন্দ্রীভূতে হয়েছে তাঁদের পুত্রের প্রতি স্বামীর উদাসীন আচরন, তার মধ্যে কেকয়ীর রয়েছে পুত্র স্বার্থ রক্ষার বাসনা কিন্তু জনার পুত্রশোক, মেঘনাদবধ কাব্যের প্রমীলার মতো তার এক তেজস্বী নায়িকা জনা মধুসূদনের অন্যতম সৃষ্টি, নারীদের কাছে স্বামীর চেয়েও যে সন্তান প্রিয়তর — বুকচেরা ধন — তার প্রমান পাওয়া যায় জনা পত্রিকায়।

জনা একজন মাতা, পুত্রহারা মাতা, পুত্র শোকে তার হৃদয়-বিদারী শোকোচ্ছ্বাসের পরে স্বামীর প্রতি অভিমানী স্বর ফুটে উঠেছে। তিনি স্বামীর কাছে বিদায় প্রার্থনা করেছেন — 'মাগি চিরবিদায় ও পদে', বিদায় নিয়ে জনা তার পুত্রের উদ্দেশ্যেই যাত্রা করতে চায়। এখানে জনার কোমল হৃদয় বৃত্তির পরিচয় সুস্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠেছে, সমগ্র পত্রিকাটির মধ্যে জনার তেজ, সাহস, নারী হৃদয়ের কোমলতা, অপত্য স্নেহ, পতি প্রেম ও দাম্পত্য জীবনের কর্তব্যবোধ চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে।

পুত্রশোক জনার পক্ষে সহনীয় ছিল, কেননা জনা ক্ষত্রিয় রমণী, সম্মুখ সমরে প্রিয়জন বীরগতি প্রাপ্ত হলে তাঁদের মধ্যে দুঃখ শোকের চেয়েও গৌরব বেশি বোধ হয়, কিন্তু জনার পক্ষে অসহনীয় অবস্থা হল তাঁর স্বামীর অন্যায় আচরণ, জনার আত্মমর্যাদায় তা আঘাত করে, সে আঘাত জনাকে আত্মহননের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে, তাই জনা তাঁর স্বামীকে লিখেছেন —

"ক্ষত্রকুলবালা আমি; ক্ষত্র-কুল-বধূ
কেমনে এ অপমান সব ধৈর্য ধরি'?
ছাড়িব এ পোড়া প্রাণ জাহ্নবীর জলে;
দেখিব বিস্মৃতি যদি কৃতান্ত নগরে
লভি অন্তে।"

ঃ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ

আমরা এই প্রকল্পমূলক কাজটি সম্পন্ন করতে গিয়ে যে সব ব্যক্তি বৃন্দ সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাদের সবার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই। কৃতজ্ঞতা জানাই সেই সমস্ত গ্রন্থাগারকে যেখানে থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন গ্রন্থ ও পত্রপত্র আমার প্রকল্প রচনার কাজে সাহায্য করেছে। এছাড়া স্বর্ণময়ী যোগেন্দ্রনাথ মহাবিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের তাদের পরামর্শ, নির্দেশনা ও পরিচালনায় আমরা এই অনুসন্ধান মূলক কাজটি সফল হয়েছে।

Department of Bengali
S.J. Mahavidyalaya

EXAMINED

[External]
2/9/23